পাঠক-লেখক সম্পর্ক

অণ মিত্র

কবি অণ মিত্র সাহিত্যে সৃজনত্রিয়া প্রসঙ্গে আলোচনায় এক জায়গায় বলছেন-- বই পড়া নিয়ে। জ্ঞান অর্জন নিয়ে। পাঠক-লেখক সম্পর্ক নিয়ে। তারই অংশবিশেষ তুলে ধরি।-- সম্পাদক

উপন্যাস নাটক ইত্যাদি রচনার কাজে জ্ঞান-বিদ্যা অর্জনের কথা যখন উঠল তখন বই পড়ার বিষয়ে একটু ফিরে আসা যাক। সৃজনশীল লেখকেরা এমনিতে বই পড়বেন না, নিজের অভিজ্ঞতা সম্বল করে শুধু লিখে যাবেন এমন সিদ্ধান্ত আমি করছি না। সেটা হাস্যকর। কেন না কোনো লেখক তো ইতিহাসে কোনো বিচ্ছিন্ন একক মানুষ নয়। এক ধারাবাহিকতায় সে স্থাপিত। তার নিজের অবস্থিতি এবং তার পারিপার্শ্ব তার আত্মপ্রকাশের পটভূমি। সে সম্বন্ধে সচেতনতা তার নিজের গরজেই আসে এবং আরো জানার চেষ্টা ঐ একই গরজে স্বাভাবিক তা বই পড়েই হোক বা দেখে আর শুনেই হোক। এছাড়াও লেখকের পক্ষে বই পড়ার আর একটা তাৎপর্য আছে। তা হল অভিঘাতের ভূমিবিস্তার। অন্যের অভিজ্ঞতার অঙ্কুশ তার মনকে মুহূর্তে সত্রিয় করে তুলতে পারে। কিন্তু এ অভিজ্ঞতার ব্যাপারটা পরোক্ষ। পান্ডিত্যের ক্ষেত্রে তা মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে তার কোনো মূল্য নেই যদি না তা পাঠকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে যুক্ত হয়। তা যদি হয় তবে তা এমন অভিঘাত সঞ্চার করতে পারে যা তাকে নিজের সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করবে। কাব্য উপন্যাস নাটক সব বিভাগেই এরকম ঘটা সম্ভব। অভিজ্ঞতার এই অন্বয় যেখানে হয় না সেখানে ঐ বইয়ের অভিজ্ঞতা শুধু পন্ডিতীজ্ঞানের একটা বিষয় হয়ে থাকবে অথবা সুযোগ হলে বক্তৃতা দেবার। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করছি। ফরাসী কবি র‍্যাবোর একটি কবিতা আছে " নেশার সকাল"। এ কবিতায় তিনি মানুষী অস্তিত্বকে যে-দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং যে-ভাবনায় ভাবিত হচেছন তা এক hallucination-এর মতো, শব্দের ওলটপালটে যেভাবে এক রহস্যময় পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করতে চাইছেন তা সাধারণ বোধের অন্তর্গত নয়। এ কবিতা যখন আমি পড়ি তখন কবির ক্ষমতায় বিস্মিত হই, তবে অনেক দূর পর্যন্ত তা আমাকে নাড়ায় না, কিন্তু আমাকে আমূল নাড়িয়ে দেয় শেষ দুই বাক্যে যখন র‍্যাঁবো বলেন "আমরা জানি কীভাবে আমাদের জীবন দিতে হয় প্রত্যেক দিন সম্পূর্ণভাবে। এটা হল খুনীদের কাল।" এই উচ্চারণ সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের এবং প্রত্যেক দিনের অভিজ্ঞতাকে আলোড়িত করে তোলে এবং আমি যদি লেখক হই তবে তা আমার সৃজনত্রিয়ার একটা পথ খুলে দেয়। শুধু কাব্য নয়, অন্য কোনো বিষয়ের গ্রন্থও, যেমন ইতিহাস বা দর্শন বা মনস্তত্ব, এই সৃজন উদ্দীপনা সঞ্চার করতে পারে যদি তা পাঠকের (যিনি লেখক;) দৃষ্ট ও অনুভূত, বাইরের ও ভেতরের অভিজ্ঞতার অনুরণন তোলে।

কবিতায় চিত্রকল্প নিছক ছবি আঁকার খাতিরে ছবি আঁকা নয়। কোন দৃশ্য বর্ণনা এইসব ছবির উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য কবির অনুভব ও মনোভাবকে ফুটিয়ে তোলা। কবির ভাবনা ও গূঢ় অভিজ্ঞতা চিত্রকল্প থেকে বিচ্ছুরিত হয়।

কিন্তু কবি যে ভাবনা ও অভিজ্ঞতাকে এইভাবে রূপ দেন, তা এই জগতেরই ভাবনা ও অভিজ্ঞতা। সুতরাং তাদের সঙ্গে অন্য মানুষের মনের যোগসূত্র কোথাও না কোথাও থাকে। এই "অন্য মানুষ" আমাদের পাঠক। সে একজন লেখক থেকে

সাধারণ মানুষ সবাই।

যদি কৃত্রিমভাবে তৈরি করা কথা না হয়, যদি বিভ্রান্তি তার জনক না হয়, তাহলে একলার কথা বাস্তবিক একলার কথা নয়, অনেকের কথা। প্রাথমিক অভিনবত্বে যতই দুর্গম মনে হোক, শেষ পর্যন্ত বহু পাঠক ও শ্রোতা তার মধ্যে আত্মীয়তা আবিষ্কার করেন।

বাইরের এইসব বাধা পার হতে বেশি সময় লাগে না। পাঠকের পুরোনো অভ্যাসের জায়গায় নতুন অভ্যেস তৈরি হয়। তখন কবিতার কোনো 'সৃষ্টিছাড়া' রূপ তাকে আর প্রতিহত করে না। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে যে-প্রশ্ন থেকে যায় তা হলো পাঠকদের সঙ্গে সংযোগের প্রশ্ন। কারণ তা কবিতার বক্তব্যের প্রশ্ন। সেটাই আসল। বোধ্য হবার একটা দায় লেখকের থাকেই। তা যদি না থাকত, তাহলে কবিতা লিখে অন্যের কাছে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কোন লেখক তাঁর মনের অন্দরমহলে কী লুকোচুরি খেলছেন এবং কত কায়দা ক'রে তাঁর কী কথা গোপন রাখছেন তা জানবার জন্যে গলদ্‌ঘর্ম হবার কোনো আগ্রহ মানব-সমাজের থাকতে পারে না। সুতরাং সংযোগের প্রশ্ন অপরিহার্য।

কবিতা নানা রকমের লেখা হয়। বাইরের কোনো ফরমাসের ব্যাপার এটা নয়। যে-কবির যে-স্বভাব এবং যে-মেজাজ সেই অনুযায়ীই তিনি লেখেন। কেউ লেখেন দার্শনিক ভাষণের মনোভাব নিয়ে, কেউ লেখেন নিছক শিল্প-সৃষ্টির অভিলাষে, কেউ লেখেন মস্তিষ্ককে প্রবল রেখে (মস্তিষ্ক নিশ্চয় সর্বদাই জাগ্রত থাকে, নইলে শব্দের নির্বাচিত বিন্যাস কী করে সম্ভব? স্বয়ঞ্চল রচনা কি সত্যিই স্বয়ঞ্চল?) আবার কেউ লেখেন হৃদয় ও অনুভব থেকে। আমার দৃষ্টিতে হৃদয়-সংবেদনাটাই কবিতার স্বধর্ম। বুদ্ধির খেলা দেখবার জন্যে লোকে কবিতার কাছে যাবে কেন? কবিতার গভীর উৎস হৃদয় এবং তার লক্ষ্যও হৃদয়। কবিতার শব্দাবলীর জন্ম অনুভবে, কল্পনায় তাদের পুষ্টি এবং তারা প্রতিধ্বনি জাগাতে চায় অনুভবে। বুদ্ধির ভূমিকা কবিতার সৃষ্টি এবং কবিতার উপলব্ধি উভয়তেই গৌণ মনে হয়।

পাঠকের হৃদয় কি শর্তে সাড়া দেবে সেটা হল সংযোগের সমস্যা। একটা সমভূমি সেজন্যে নিশ্চয় প্রয়োজন। সেটা কী হতে পারে সকলের সাধারণ চেতনা ছাড়া? স্পষ্ট বলতে গেলে তা হলো সমাজ-চেতনা। মানবিক পরিস্থিতির পট-ভূমিতে যদি শিল্পসৃষ্টি বিধৃত হয় তবেই তা অন্যের মধ্যে অনুরণন তুলতে পারে। মানব-সমাজের পরিমন্ডল কবিতার পক্ষে তেমন, যেমন মাছের পক্ষে জল। সামাজিক ভ্রাতৃত্বই কবি ও পাঠকের মধ্যে আসল সম্পর্ক। আর তাই যদি না হবে, তাহলে বোদলের প্রায় সওয়া শো বছর পরে এই বঙ্গরঙ্গ ভূমিতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন খুঁজে পাবেন কেন? যাঁরা সমাজ-চেতনারহিত বিশুদ্ধ শিল্পের কথা বলেন, তাঁদের মনের মধ্যেও এই চেতনা কোনো একভাবে থাকে, যার জন্যেই ও-কথা তাঁরা বলেন। সমাজ-চেতনা তাঁদের মনের পক্ষে এমন পীড়াদায়ক হয়ে ওঠে যে, তাঁরা হয় তা থেকে পালাতে চান, নয় তা থেকে পাঠক-সাধারণের মন সরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করেন।

পাঠকদের সঙ্গে বিস্তৃত সংযোগ তখনই ঘটে যখন কবির নিজের কথা শুধু তাঁর নিজের আর থাকে না। আগের বিভিন্নকালে ধর্ম এবং সমাজ অথবা নতুন সমৃদ্ধি থেকে উদ্ভুত একই মানসিক আবহাওয়ার ভিতরে কবি ও তাঁর পাঠক বা শ্রোতার এক সহজ যোগাযোগ ছিল। এখন সে-সংযোগ বিনষ্ট। বর্তমান আজ বিচ্ছিন্নতার প্রতিরূপ। এখনকার সংযোগ এখনকার মতো করেই ঘটতে পারে। সমাজ-বাস্তবের যে-যন্ত্রণা আজ মানুষের অস্থিমজ্জায় এবং ভবিষ্যতের যে-আকাঙ্খা তার রক্তে অথচ যা নিয়ত প্রতিহত, কবি ও পাঠকের মধ্যে সেই তো একমাত্র সাধারণভূমি। সেইখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে তা শোনবার জন্যে পাঠকদের উৎসুক হওয়া স্বাভাবিক। আপাতদৃষ্টিতে যা দুর্বোধ্য, সেক্ষেত্রে বেশি দিন তা দুর্বোধ্য থাকে না। অবশ্য তার মানে এই নয় যে প্রত্যেক রচনাকে এক বিশেষ ছাঁচে ফেলতে হবে। এমন প্রস্তাব নিতান্তই হাস্যকর। বস্তুত, কোনো সৃজনশীল ক্ষমতা সেরকম যান্ত্রিকতাকে মেনে নিতে পারে না, মেনে নেয় না। তা নয়। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির অন্তরঙ্গ আবহাওয়া যদি সাধারণ জীবনের আবহাওয়া না হয়, তাহলে তা থেকে মানুষ দূরে সরে যাবেই।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com